জিদ

জসীমউদ্‌দীন

এক তাঁতি আর তার বউ। তারা বড়োই গরিব। কোনোদিন খায়, কোনোদিন খাইতে পায় না। তাঁত খুঁটি চালাইয়া, কাপড় বুনাইয়া, কীই-বা তাহাদের আয়?

আগেকার দিনে তাহারা বেশি উপার্জন করিত। তাহাদের হাতের একখানা শাড়ি পাইবার জন্য কত বাদশাজাদিরা, কত নবাবজাদিরা তাহাদের উঠানে গড়াগড়ি পাড়িত।

তখন একখানা শাড়ি বুননে মাসের পর মাস লাগিত। কোনো কোনো শাড়ি বুনন করতে বৎসরেরও বেশি সময় ব্যয় হইত।

সেইসব শাড়ি বুনাইতে কতই-না যত্ন লইতে হইত। রাত থাকিতে উঠিয়া তাঁতির বউ চরকা লইয়া ঘড়র-ঘড়র করিয়া সুতা কাটিত। খুব ধরিয়া ধরিয়া চোখে নজর আসে না, এমনই সরু করিয়া সে সুতা কাটিত। ভোরবেলায় আলো-আঁধারির মধ্যে সুতা-কাটা শেষ করিতে হইত। সূর্যের আলো যখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত, তখন সুতা কাটিলে সুতা তেমন মুলাম হইত না।

তাঁতি আবার সেই সুতায় নানা রকমের রং মাখাইত। এত সরু সুতা আঙুল দিয়া ধরিলে ছিঁড়িয়া যায়। তাই বাঁশের সরু শলার সঙ্গে আটকাইয়া, সেই সুতা তাঁতে পরাইয়া, কত রকমের নকশা করিয়া তাঁতি কাপড় বুনাইত। সেই শাড়ির ওপর বুনট করা থাকিত কত রাজকন্যার মুখের রঙিন হাসি, কত রূপকথার কাহিনি, কত বেহেশতের আরামবাগের কেচ্ছা। ঘরে ঘরে মেয়েরা সেই শাড়ি পরিয়া যখন হাঁটিত, তখন সেই শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে কত গুল-এ-বকওয়ালি আর কত লুবানকন্যার কাহিনি ছড়াইয়া পড়িত।

শাড়িগুলির নামই-বা ছিল কত সুন্দর। কলমি ফুল, গোলাপ ফুল, মন-খুশি, রাসমণ্ডল, মধুমালা, কাজললতা, বালুচর। শাড়িগুলির নাম শুনিয়াই কান জুড়াইয়া যায়। কিন্তু কীসে কী হইয়া গেল! দেশের রাজা গেল। রাজ্য গেল। দেশবাসী পথের ভিখারি সাজিল। বিদেশি বণিক আসিয়া শহরে কাপড়ের কল বসাইল। কলের ধোঁয়ার ওপর সোয়ার হইয়া হাজার হাজার কাপড় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল; যেমন সস্তা তেমনই টেকসই। আবার যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়। তাঁতির কাপড় কে আর কিনিতে চায়!

হাট হইতে নকশি-শাড়ি ফিরাইয়া আনিয়া তাঁতিরা কাঁদে। শূন্য হাঁড়িতে চাউল না-পাইয়া তাঁতির বউ কাঁদে। ধীরে ধীরে তারা সেই মিহিন শাড়ি বুনন ভুলিয়া গেল। এখনকার লোক নকশা চায় না। তারা চায় টেকসই আর সস্তা কাপড়। তাই তাঁতি মিলের তৈরি মোটা সুতার কাপড় বুনায়। সেই সুতা আবার যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না। চোরাবাজার হইতে বেশি দামে কিনিতে হয়। এখন কাপড় বেচিয়া যাহা লাভ হয়, তাহাতে কোনোরকমে শুধু বাঁচিয়া থাকাই যায়। এটা-ওটা কিনিয়া মনের ইচ্ছামতো খাওয়া যায় না।
কিন্তু তাঁতির বউ সে কথা কিছুতেই বুঝিতে পারে না। সে তাঁতিকে বলে, 'তোমার হাতে পড়িয়া আমি একদিনও ভালোমতো খাইতে পারিলাম না। এত করিয়া তোমাকে বলি, হাটে যাও। ভালোমতো একটা মাছ কিনিয়া আনো। সে কথা কানেই তোলো না।'
তাঁতি উত্তর করে, 'এই সামনের হাটে যাইয়া তোমার জন্য ভালোমতো একটা মাছ কিনিয়া আনিব।' সে হাট যায়, পরের হাট যায়, আরও এক হাট যায়, তাঁতি কিন্তু মাছ কিনিয়া আনে না।
সেদিন তাঁতির বউ তাঁতিকে ভালো করিয়াই ধরিল, 'এ হাটে যদি মাছ কিনিয়া না-আনিবে তবে রহিল পড়িয়া তোমার চরকা, রহিল পড়িয়া তোমার নাটাই, আমি আর নলি কাটিব না। রহিল পড়িয়া তোমার শলা, আমি আর তেনা কাড়াইব না। শুধু শাকভাত আর শাকভাত, খাইতে খাইতে পেটে চর পড়িয়া গেল। তাও যদি পেট ভরিয়া খাইতে পাইতাম।'

তাঁতি কী আর করে? একটা ঘষাপয়সা ছিল, তাই লইয়া তাঁতি হাটে গেল। এ-দোকান ও-দোকান ঘুরিয়া অনেক দর-দস্তুর করিয়া সেই ঘষাপয়সাটা দিয়া তাঁতি তিনটি ছোট্ট মাছ কিনিয়া আনিল।
মাছ দেখিয়া তাঁতির বউ কী খুশি! আহ্লাদে আটখানা হইয়া সে মাছ কুটিতে বসিল। এভাবে ঘুরাইয়া, ওভাবে ঘুরাইয়া কত গুমর করিয়াই সে মাছ কুটিল! যেন সত্য সত্যই একটা বড়ো মাছ কুটিতেছে। তারপর পরিপাটি করিয়া সেই মাছ রান্না করিয়া তাঁতিকে খাইতে ডাকিল।

তাঁতি আর তার বউ খাইতে বসিল। তিনটি মাছ। কে দুইটি খাইবে, আর কে একটি খাইবে— কিছুতেই তারা ঠিক করিতে পারে না। তাঁতি বউকে বলে, 'দেখ, রোদে ঘামিয়া, কত দূরের পথ হাঁটিয়া এই মাছ কিনিয়া আনিয়াছি। আমি দুইটি মাছ খাই। তুমি একটা খাও।'

বউ বলে, 'উঁহু। তাহা হইবে না। এতদিন বলিয়া কহিয়া কত মান-অভিমান করিয়া তোমাকে দিয়া মাছ কিনাইয়া আনিলাম। আমিই দুইটি মাছ খাইব।' তাঁতি বলে, 'তাহা কিছুতেই হইবে না।' কথায় কথায় আরও কথা ওঠে! তর্ক বাড়িয়া যায়। সেই সঙ্গে রাতও বাড়ে, কিন্তু কিছুতেই মীমাংসা হয় না, কে দুইটি মাছ খাইবে আর কে একটি মাছ খাইবে! অনেক বাদানুবাদ, অনেক কথা কাটাকাটি, রাতও অর্ধেক হইল। তখন দুইজনে স্থির করিল, তাহারা চুপ করিয়া ঘুমাইয়া থাকিবে। যে আগে কথা বলিবে, সে-ই একটা মাছ খাইবে।
তাঁতি এদিকে মুখ করিয়া, তাঁতির বউ ওদিকে মুখ করিয়া শুইয়া রহিল। থালাভরা ভাত-তরকারি পড়িয়া রহিল। রাত কাটিয়া ভোর হইল, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নাই। ভোর কাটিয়া দুপুর হইল, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নাই।

দুপুর কাটিয়া সন্ধ্যা হইল, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নাই। বেলা যখন পড়-পড়, আকাশের কিনারায় সাঁঝের কলসি ভর-ভর, পাড়ার লোকেরা বলাবলি করে, 'আরে ভাই! আজ তাঁতি আর তাঁতির বউকে দেখিতেছি না কেন? তাদের বাড়িতে তাঁতের খটর-খটরও শুনি না, চরকার ঘড়র-ঘড়রও শুনি না। কোনো অসুখ-বিসুখ করিল নাকি? আহা! তাঁতি বড়ো ভালো মানুষটি। বেচারা গরিব হইলে কী হয়, কারো কোনো ক্ষতি করে নাই কোনোদিন।'
একজন বলিল, 'চলো ভাই! দেখিয়া আসি ওদের কোনো অসুখ-বিসুখ করিল নাকি।'
পাড়ার লোকেরা তাঁতির দরজায় আসিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নাই। ভিতর হইতে দরজা বন্ধ।
তখন তারা দরজা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তাঁতি আর তাঁতির বউ শুইয়া আছে। নড়ে না, চড়ে না—ডাকিলেও সাড়া দেয় না। তারপর গাঁয়ের মোল্লা আসিয়া পরীক্ষা করিয়া স্থির করিল, তাহারা মরিয়া গিয়াছে।
আহা কী ভালোবাসা রে! তাঁতি মরিয়াছে, তাহার শোকে তাঁতিবউও মরিয়া গিয়াছে। এমন মরা খুব কমই দেখা যায়। এসো ভাই আতর-গোলাপ মাখাইয়া কাফন পরাইয়া এদের একই কবরে দাফন করি।
গোরস্তান সেখান হইতে এক মাইল দূরে। এই অবেলায় কে সেখানে যাইবে? পাড়ার দুইজন ইমানদার লোক মরা কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতে রাজি হইল। মোল্লা সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কবর দেওয়ার সময় জানাজা পড়িতে হইবে। গোরস্তানে মুরদা আনিয়া নামানো হইল; মোল্লা সাহেব একটি খুঁটার সঙ্গে তাঁর ঘোড়াটা বাঁধিয়া সমস্ত তদারক করিতে লাগিলেন।

তাঁর নির্দেশমতো কবর খোঁড়া হইল। তাঁতি আর তাঁতির বউকে গোসল করাইয়া, কাফন পরাইয়া সেই কবরের মধ্যে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। তখনও তাহারা কথা বলে না। তাহাদের বুকের ওপর বাঁশ চাপাইয়া দেওয়া হইল। তখনও তাহারা কথা বলে না। তারপর যখন সেই বাঁশের ওপর কোদাল কোদাল মাটি ফেলানো হইতে লাগিল, তখন বাঁশ-খুঁটি সমেত তাঁতি লাফাইয়া বলিয়া উঠিল, 'তুই দুইটা খা, আমি একটা খাব।'

সঙ্গে ছিল দুইজন লোক আর মোল্লা সাহেব। তারা ভাবিল, নিশ্চয়ই ওরা ভূত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গের দুইজন লোক মনে করিল, তাঁতি যে তার বউকে দুইটা খাইতে বলিল, নিশ্চয়ই সে তাহাদের দুইজনকে খাইতে বলিল। তখন তাহারা ঝুড়ি কোদাল ফেলিয়া দে-দৌড়, যে যত আগে পারে! মোল্লা সাহেব মনে করিলেন, তাঁতি নিজেই আমাকে খাইতে আসিতেছে। তখন তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘোড়ার পিঠে সোয়ার হইয়া মারিলেন চাবুক। ভয়ের চোটে খুঁটি হইতে ঘোড়ার দড়ি খুলিয়া লইতে ভুলিয়া গেলেন।

চাবুক খাইয়া ঘোড়া খুঁটি উপড়াইয়া দিল ছুট। ঘোড়া যত চলে সেই দড়িতে বাঁধা খুঁটা আসিয়া মোল্লা সাহেবের পিঠে তত লাগে। তিনি ভাবেন, বুঝি ভূত আসিয়া তাঁর পিঠে দাঁত ঘষিতেছে। তখন তিনি আরও জোরে জোরে ঘোড়ার গায়ে চাবুক মারেন, আর দড়ি সমেত খুঁটা আসিয়া আরও জোরে জোরে তাঁর পিঠে লাগে।

হাসিতে হাসিতে তাঁতি আর তাঁতির বউ বাড়ি আসিয়া ভাত খাইতে বসিল।

লেখক-পরিচিতি

জসীমউদ্‌দীনের জন্ম ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে। পল্লিকবি হিসেবে তিনি বিশেষভাবে খ্যাত। জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় গ্রামবাংলার রূপ ও সাধারণ মানুষের জীবনের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে সহজ-সরল ভাষা আর সাবলীল ছন্দে। 'নক্সী-কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'রাখালী', 'ধানখেত' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য। কবিতা ছাড়াও তিনি গল্প, ভ্রমণ-কাহিনি, স্মৃতিকথা, নাটক, গীত ও প্রবন্ধের বইও রচনা করেছেন। শিশুদের জন্য লিখেছেন 'ডালিম কুমার' নামে একটি অসাধারণ বই। সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য জসীমউদ্‌দীন বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা পান। তিনি একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদকেও ভূষিত হন। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে কবির মৃত্যু হয়।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

এক তাঁতি আর তাঁতিবউ তাঁত চালিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ দেশে কাপড়ের কল আসলে তাঁতিদের কাপড় আর কেউ কিনতে চাইল না। ফলে তাঁতি পরিবার বড়ো অভাবে পড়ল। এত অভাবে যে, তারা ভালো করে খেতেও পায় না। বউয়ের আবদারে বাধ্য হয়ে অভাবের সংসারে তাঁতি হাট থেকে তিনটি ছোটো আকারের মাছ কিনে আনল, সখ করে তাঁতিবউ তা রান্না করল। দুজনে খেতে বসলে তাদের মধ্যে কথা উঠল কে দুটি খাবে, কেই-বা একটি খাবে। পরে মীমাংসা হলো তারা চুপ করে থাকবে, যে আগে কথা বলবে সে-ই একটা খাবে। এমন জেদ ধরল দুজনে যে, কেউ কথা আর বলে না। মরে যাওয়ার জোগাড় হলো তাদের, পাড়া-প্রতিবেশীরা মনে করল দুজন বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তাদের গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া হলো, কবর খুঁড়ে গোর দেওয়া হচ্ছে এমন সময় তাঁতি 'তুই দুইটা খা, আমি একটা খাব' বলে লাফ দিয়ে উঠল। যারা গোর দিতে গিয়েছিল, মুরদা কথা বলছে দেখে তারা ভাবল, এরা ভূত হয়ে গেছে; তাই সবাই দৌড়ে পালাল। পরে তাঁতি ও তাঁতিবউ বাড়িতে ফিরে ভাত খেতে বসল।

অনাবশ্যক জেদ যে মানুষের জীবনকে জটিল করে তোলে এবং অন্যকেও সমস্যায় ফেলে দেয়, গল্পটিতে এই সত্য প্রকাশিত হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

জিদ — একগুঁয়েমি, নাছোড় ভাব।
চরকা — সুতাকাটার যন্ত্র।
মুলাম — মোলায়েম, নরম।
গুল-এ-বকওয়ালি — বাকওয়ালি ফুল। এই নামে এক পরি ছিলেন। এখানে তার কাহিনির কথাই বলা হয়েছে।
বণিক — ব্যবসায়ী।
সোয়ার — আরোহণ করা।
টেকসই — মজবুত।
নাটাই — যে চরকি বা শলাকায় সুতা জড়ানো হয়।
শলা — কাঠি।
নলি — সুতা জড়াবার ছোটো নল।
তেনা — কাপড়ের টুকরা।
ঘষাপয়সা — ক্ষয়ে যাওয়া পয়সা।
আহ্লাদে আটখানা — ভীষণ খুশি হওয়া।
গুমর — গর্ব, দেমাক, অহমিকা।
বাদানুবাদ — তর্ক-বিতর্ক।
পরিপাটি — সাজানো-গোছানো।
মীমাংসা — বিবাদ বা সমস্যার সমাধান।
মুরদা — মৃতদেহ।